জীবনে যা দেখলাম

অষ্টম খণ্ড (১৯৯৪-১৯৯৬)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

সূচিপত্র

ফাসাদই অশান্তির মূল ১৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৭
বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য কে দায়ী? ১৮
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ ১৯
আমেরিকা গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসের নায়ক ২২
আমেরিকাকে মোড়লগিরির দায়িত্ব কে দিল? ২২
মুসলিম বিশ্বের বেলায় আমেরিকার পলিসি ২৩
১৯৯৪ সালে ব্যাপক জনসভা ২৪
বিদেশ সফরের প্রয়োজনীয়তা ২৪
পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দিলাম ২৫
সৌদি আরব ও কুয়েত সফরের প্রস্তুতি ২৬
সৌদি আরব সফর ২৭
জদ্দায় অবস্থান ২৮
মক্কা শরীফ গমন ২৯
ওমরাহ পালন ৩০
মক্কা শরীফে তিন দিন ৩০
ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী ৩২
সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের নিকট আমার বক্তব্য ৩৩
স্বাধীনতা লাভের পর ৩৪
বাংলাদেশ সম্পর্কে সৌদি সরকারের পলিসি ৩৫
শাসনতন্ত্র সংশোধনের সুফল ৩৩
বাংলাদেশে নির্বাচনপদ্ধতি ৩৫
ভারতের আধিপত্য সম্পর্কে সতর্কতা ৩৬
জদ্দায় তৎপরতা ৩৬
IDB-তে মামুনের চাকরি ৩৭
মদীনা শরীফ সফর ৩৮
কিং ফাহদ হলি কুরআন কমপ্লেক্স ৩৮
জান্নাতুল বাকী' যিয়ারত ৩৯
মদীনায় মোমেনের সাথে দেখা ৪০
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ৪০
সৌদি সরকারের নিকট মাওলানা মওদূদীর পরামর্শ ৪১

এর কারণ কী? ১৯৭
বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারত ও আমেরিকার ভূমিকা ১৯৮
মুসলিম দেশের জন্য আমেরিকার গণতন্ত্র ১৯৯
ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকার ক্রুসেড ২০০
ভারত বিভাগ কি ভুল ছিল? ২০২
ভারত বিভাগ না হলে মুসলমানদের কী দশা হতো? ২০২
পাকিস্তান কায়েমের পরই বাঙালি মুসলমানদের উন্নতি শুরু হয় ২০৩
স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানদের অগ্রগতি ২০৩
ভারত বিভাগ না হলে ২০৪
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলমানদের প্রতি আকুল আবেদন ২০৫
গণতন্ত্র কি কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ? ২০৬
ইসলামকে উৎখাত করা সম্ভব নয় ২০৮
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অভিভাবক ২০৮
অসহায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জঘন্য অপচেষ্টা ২০৯
শাসনতন্ত্রের মর্যাদা ২১০
বাংলাদেশের সংবিধান ২১১
প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনকৌশল ২১২
ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের সাম্প্রতিক দাবি ২১৩
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ২১৩
সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ২১৪
ভারতে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করল, আমরা কেন ব্যর্থ হলাম? ২১৫
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের এ দশা কেন? ২১৬
দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর প্রশংসনীয় ভূমিকা ২১৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ২১৮
মজলিসে শূরার অধিবেশন ২১৯
সেক্রেটারি জেনারেলের ভাষণ ২২০
চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমার সিঙ্গাপুর গমন ২২০
চিকিৎসা শুরু ২২১
চিকিৎসার ফলাফল ২২২
সিঙ্গাপুর সফর সমাপ্ত ২২২
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন ২২৩
সেক্রেটারি জেনারেলের ভাষণ ২২৪
আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ ২২৫
প্রতি বছর ব্রিটেনে কেন আসি ২২৭

৩০১.

ফাসাদই অশান্তির মূল

ফাসাদ কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা। সূরা রূমের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষের নিজ হাতের কামাইয়ের ফলে জলে-স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে।' রাসূল (স)-এর সময় রোম ও পারস্যের মধ্যে যে যুদ্ধ চলেছিল, এ আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মাওলানা মওদূদী (র)-এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ লাগলে যে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস, গোলযোগ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তা সহজেই অনুমেয়। ঐ চরম পরিস্থিতিকে বোঝানোর জন্য কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে 'ফাসাদ' শব্দটি অনৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, ধ্বংস, বিকৃতি, ভ্রান্তি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আরবী 'সালাহ' শব্দের বিপরীত অর্থেই 'ফাসাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সালাহ মানে সঠিকতা, সততা, যথাযথতা, উপকারিতা, কার্যকারিতা ইত্যাদি।

ফাসাদকারী ব্যক্তি ও শক্তিকে মুফসিদ এবং এর বিপরীত ব্যক্তি ও শক্তিকে মুসলিহ বলা হয়। কুরআনে বেশ কয়েক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ মুফসিদদেরকে পছন্দ করেন না।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়। গোটা বিশ্বে ফাসাদ আর ফাসাদ চলে। মানবজাতি যাতে ভবিষ্যতে এ জাতীয় অশান্তির শিকার না হয়, সে মহান উদ্দেশ্যে ঐ যুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তি (আমেরিকা, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া) বর্তমান জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। যেসব কারণে যুদ্ধ বাধে তা যাতে রোধ করা যায়, সেজন্য একটি চার্টার প্রণয়ন করা হয়। ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সদস্য হবে এবং তাদেরকে উক্ত চার্টারও মেনে চলতে হবে। ১৫টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিল এ চার্টার অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতে না পারে। কোথাও যুদ্ধাবস্থা দেখা গেলে তা প্রশমিত করার দায়িত্বও পালন করবে জাতিসংঘ। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যত সমস্যাই সৃষ্টি হোক তারা যুদ্ধ হতে দেবে না, বিনা যুদ্ধে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করবে। সংলাপ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের মীমাংসা না হলে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে। কোনোক্রমেই যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেওয়া যাবে না। এসব সিদ্ধান্ত মেনে চলার জন্য সকল রাষ্ট্র ওয়াদাবদ্ধ।

বিশ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য কে দায়ী?

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ যথারীতি চালুই আছে। এর কারণ তালাশ করা মোটেই কঠিন নয়।

জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টার নিউইয়র্কে অবস্থিত। এ বিশাল প্রতিষ্ঠানের বিরাট খরচের জন্য যে তহবিল প্রয়োজন তাতে আমেরিকাই মোটা অংক প্রদান করে। সদস্যরাষ্ট্রের উপর ধার্যকৃত চাঁদা সবাই নিয়মমতো দিতে পারে না বলে জাতিসংঘকে আমেরিকার উপরই নির্ভর করতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল ও সমৃদ্ধশালী দেশ। তাদের মুদ্রা ডলার বিশ্বে বিরাট মর্যাদার অধিকারী। সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের পর তারাই বিশ্বের সেরা সামরিক শক্তি ও সমরাস্ত্রের অধিকারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ সভ্যতাকে বিশ্বজনীন সভ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও তারাই পালন করছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের কদণ উফট্রদ মত উধশধফধড়র্টধমভ্র টভঢ কদণ ৗণবটপধভথ মত ঘমরফঢ্‌রঢণর নামক সুস্পষ্ট ভাষায় আমেরিকার এ ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র ও স্থায়ী হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে ইসলামের পুনর্জাগরণকে প্রতিহত করা আমেরিকার কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সিকিউরিটি কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত। ১৫ সদস্যের এ সংস্থার ৫টি স্থায়ী সদস্য হলো আমেরিকা, ব্রিটেন, চিন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়া। জাতিসংঘের যেকোনো সিদ্ধান্ত এ ৫টি রাষ্ট্রের যে কেউ নাকচ করে দিতে পারে।

উপরিউক্ত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। এমনকি জাতিসংঘকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। জাতিসংঘ বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত রাখার দায়িত্ব পালন করে; কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধ করতে চাইলে জাতিসংঘ সম্মতি দিতে বাধ্য হয়। যদি সম্মতি না দেয় তাহলে জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করেই তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাই পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে, এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রই প্রধানত দায়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বে সন্ত্রাস ও যুদ্ধ চালু রেখেছে। জাতিসংঘ আমেরিকাকে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অনেক কারণেই জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য সফল করার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা কর্তব্য ছিল। কিন্তু বাস্তব সত্য এটাই যে, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই জাতিসংঘের মহান উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার দায়ে প্রধান অপরাধী হিসেবে গণ্য। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত ও ব্যাহত করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্রই পালন করে আসছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ

১. আমেরিকার সহযোগিতায় প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী জাতি মিত্রশক্তিকে বিরাট আর্থিক সাহায্য করেছে। ইহুদী জাতির কোনো রাষ্ট্র না থাকলেও তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী জাতি। বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি, ইটালি ও জাপানের ঐক্যজোট অক্ষশক্তি (Axis Power) নামে অভিহিত ছিল। এর বিরুদ্ধে আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার ঐক্যজোট মিত্রশক্তি (Allied Power) নামে পরিচিত হয়। যুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয়ে ইহুদীদের বিরাট আর্থিক অবদানের পুরস্কারস্বরূপ প্যালেস্টাইনের হাজার বছরের স্থায়ী আরব মুসলিম দেশটিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে ইহুদীদের জন্য 'ইসরাইল্ল' নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে ব্রিটেন ও রাশিয়ার সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী অভিযান চালিয়ে লাখ লাখ আরব মুসলিম অধিবাসীকে তাড়িয়ে সেখানে ইহুদী রাষ্ট্রটি মধ্যপ্রাচ্যে এক বিষফোঁড়ার মতো কায়েম করা হয়। ইসলামের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিসও ওদের দখলে চলে যায়।

ইসরাইল আমেরিকার সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। ইসরাইলের দখলের বাইরেও প্যালেস্টাইনের সকল অঞ্চলেই অন্যায়ভাবে তারা আধিপত্য বিস্তার করে আছে। স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা আমেরিকা ছয় দশকেও পূরণ করেনি।

জাতিসংঘ ইসরাইলের বিরুদ্ধে বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিলে আমেরিকা ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করে একটি সিদ্ধান্তও বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। ইসরাইলকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে যথেচ্ছাচার করার লাইসেন্স দিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি ইসরাইল প্যালেস্টাইনের নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীদেরকেও গ্রেপ্তার করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। ২০০৬ সালে ইসরাইল একাধারে দেড় মাস পর্যন্ত লেবাননের মুসলিম এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলোর সরকারের উপর যত আধিপত্যই বিস্তার করুক, ইসরাইলের প্রতি জঘন্য পক্ষপাতিত্বের কারণে বিশ্বের দেড় শ' কোটি মুসলিম উম্মাহর নিকট আমেরিকান সরকার সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য।

২. ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েতনাম একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ সত্ত্বেও কমিউনিস্টদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে আমেরিকা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ভিয়েতনামে কমিউনিস্টদেরকে দমন করার ব্যাপারটা সে দেশের জনগণের অভ্যন্তরীণ বিষয়; কিন্তু মোড়লিপনা করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জনগণের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

৩. ১৯৭৯ সালেই ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লবী সরকার কায়েম হলে আমেরিকার তল্পিবাহক ইরানের শাহের পতনের সাথে সাথে তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসকে চরম অপমান ভোগ করতে হয়। এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকার কমান্ডো বাহিনী ইরানে হামলা চালায়; কিন্তু এক অলৌকিক ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

ইরানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরাক। ইরাকের সামরিক স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ইরানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন। ইরানিরা ইসলামী বিপ্লবের প্রেরণা নিয়ে শাহাদাতের জযবার সাথে জিহাদে আত্মনিয়োগ করল। আর ইরাক নিতান্ত সাম্রাজ্যবাদী হীন উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। আমেরিকা সর্বপ্রকার মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাদ্দামকে শক্তিশালী করা সত্ত্বেও নয় বছর যুদ্ধের পর ইরাক আমেরিকা ও জাতিসংঘের সাহায্যে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে আত্মরক্ষা করল; তা না হলে ইরান ইরাক দখল করে নিতে সক্ষম হতো।

৪. আমেরিকার অস্ত্রে শক্তিমান হওয়ার পর সাদ্দাম হোসেন রাজ্য বিস্তারের নেশায় কুয়েত দখলের বাসনা করলেন; কিন্তু আমেরিকার সম্মতি না হলে জাতিসংঘ তা করতে দেবে না বলে ইরাক আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সাহায্য চাইল। রাষ্ট্রদূত আমেরিকার আপত্তি নেই বলে জানালে বিরাট ইরাকি সেনাবাহিনী ক্ষুদ্র কুয়েত রাষ্ট্রটি এক রাতেই দখল করে নেয়। কুয়েতের প্রতিরোধ করার সাধ্য না থাকায় রাজপরিবার সৌদি আরবে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সৌদি সরকার ইরাকের কুয়েত দখলের পর সৌদি আরবের তেলসমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলে ইরাকি বাহিনীর আগ্রাসনের আশঙ্কায় আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করে। আমেরিকা এ আহ্বানেরই অপেক্ষায় ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদের উপর প্রাধান্য লাভের এ মহাসুযোগ পেয়ে আমেরিকা শক্তি প্রয়োগ করে কুয়েতকে দখলমুক্ত করে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্থায়ী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে নেয়। সাদ্দাম কুয়েত দখল করার ফলে মুসলিম উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

৫. ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার জন্য বিনা তদন্তে ও বিনা প্রমাণে উসামা বিন লাদেনকে দায়ী করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেন। উসামা বিন লাদেন সৌদি নাগরিক। তিনি রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান দখলের বিরুদ্ধে জিহাদে বিরাট অবদান রেখেছেন। তিনি আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মেহমান হিসেবে সে দেশে অবস্থান করছিলেন।

উসামা বিন লাদেনকে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রেসিডেন্ট বুশ আফগান সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলেন, যাতে তাদের মেহমানকে আমেরিকার হাতে তুলে

দেওয়া হয়। তালেবান সরকার এ অন্যায় দাবি মানতে অস্বীকার করায় বুশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি আদায় করে ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের উপর হামলা করে। তালেবান সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার বেসামরিক লোক হত্যা করে দেশটি দখল করে নেয়। হামিদ কারজাই নামক এক আফগান মীরজাফর জোগাড় করে আফগানিস্তানে পুতুল সরকার কায়েম করা হয়। রাজধানী কাবুল ও কতক শহর দখল করে পুতুল সরকার দেশ চালাচ্ছে; কিন্তু তালেবান মুজাহিদগণ এ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং গ্রামাঞ্চলে জনসমর্থন পাচ্ছেন। তালেবান সরকার দেশে পূর্ণ শান্তি কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন বাহিনী গোটা দেশে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে। আফগান জনগণ কোনো কালেই বিদেশি আধিপত্য মেনে নেয়নি। বিদেশি সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত সে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল হতে পারে না।

৬. ইরানের বিরুদ্ধে সাদ্দামকে লেলিয়ে দিয়ে আমেরিকা ইরাকে যে বিরাট সামরিক শক্তি গড়ে তুলল, তা তাদের পোষ্য ইসরাইলের জন্য মারাত্মক পরিণতির কারণ হতে পারে বলে বুশ ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখলের পর মুসলিম বিশ্বের নৈতিক সমর্থন হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসরাইলের উপর দুটো মিসাইল নিক্ষেপ করায় আমেরিকা ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য ইরাককে হুমকি মনে করে।

আক্রমণের অজুহাত হিসেবে বুশ দাবি করেন যে, ইরাকে মানববিধ্বংসী বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে। জাতিসংঘের তদন্ত মিশন বারবার ইরাকে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েও ঐ জাতীয় অস্ত্র-শস্ত্র পায়নি। তবুও বুশ এ অভিযোগ অব্যাহত রাখায় তল্লাশিও অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

বুশ ইরাক হামলার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের অনুমোদন চাইলেন; কিন্তু জাতিসংঘ আফগানিস্তানে হামলার অনুমতি দিলেও ইরাক আক্রমণের অনুমতি দিতে সম্মত হলো না। জাতিসংঘের অনুমতির পরওয়া না করে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ বাহিনী ইরাক আক্রমণ করে বসল। জাতিসংঘের তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান বারবার প্রতিবাদ জানাতে থ াকলেন। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি এ দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার সময়ও জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে ভুলেননি।

ইরাক দখল করার সময় হাজার হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়। বাগদাদের মতো প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন ধ্বংস করা হয়। দখল করার পর অস্ত্র তল্লাশি আরো জোরদার করা হয়। ২০০৫ সালে তদন্তকারীরা ঘোষণা করেন, ইরাকে মানববিধ্বংসী কোনো অস্ত্র নেই। প্রমাণিত হলো যে, প্রেসিডেন্ট বুশ চরম মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে হামলা করেছেন।

এরপরও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে তিনি যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মহান উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ইরাকে তিনি গৃহযুদ্ধ চালু করার ব্যবস্থা করলেন। সাদ্দামের শাসনামলে গণতন্ত্র না থাকলেও রোজ এভাবে লোক নিহত হতো না।

সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিচার করার কোনো অধিকার ইরাকে বুশের পুতুল সরকারের ছিল না। যে অপরাধে সাদ্দামকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, এর জন্য জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আদালত রয়েছে। সাদ্দামকে বিচারের প্রহসন করে নির্মমভাবে ঈদের দিন ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

বুশের ভ্রান্ত ইরাক নীতির ফলে নিজের দেশে তো তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেনই, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে চরম ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ইরাক আমেরিকার জন্য দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হলো। ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনীকে শুধু পরাজয় নয়, অপমানিত হয়ে বিদায় নিতে হবে।

আমেরিকা গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসের নায়ক

প্রেসিডেন্ট বুশ নির্লজ্জের মতো দাবি করেন যে, তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। উপরিউক্ত ৬টি উদাহরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসের প্রবর্তক ও নায়ক। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমেরিকা জাতিসংঘকে পঙ্গু করে রেখেছে। ইরাক ইস্যুতে জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে যে উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে, তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচিত হলো কি না কে জানে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে লীগ অব নেশন্‌স নামে জাতিসংঘের অনুরূপ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুদ্ধবাজ জার্মানির হিটলার ও ইটালির মুসোলিনি লীগ অব নেশন্‌সকে অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধায়। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে পাস কাটিয়ে যেভাবে ইরাকে হামলা করল তাতে প্রমাণিত হলো যে, জাতিসংঘ যুদ্ধ বন্ধ করতে অক্ষম। এ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাই প্রবল হলো।

আমেরিকাকে মোড়লগিরির দায়িত্ব কে দিল?

বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করে বলেই ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রই জাতিসংঘকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জাতিসংঘই বিশ্বের স্বীকৃত অভিভাবক। জাতিসংঘ আমেরিকাকে বিশ্বে মোড়লগিরি করার কোনো দায়িত্ব দেয়নি। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বে সকল দিক দিয়ে শান্তি কায়েমের উদ্দেশ্যে অনেক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এর প্রতিটিই উক্ত সনদ অনুযায়ী বিশুদ্ধ বলে গণ্য। বিশ্বশান্তি ও মানবজাতির কল্যাণের পক্ষেই ঐসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যদি ঐসব সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে উপরিউক্ত ৬টি অঘটনের একটিও ঘটতে পারত না।